ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা

সাহাবায়ে কেরামের ঈমানদীপ্ত জীবন

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম)

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, যান্ত্রিক উপায়ে কোনো প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন দেশীয় ও ইসলামী আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা

সাহাবায়ে কেরামের ঈমানদীপ্ত জীবন

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম)

(৫৪জন সাহাবীর জীবনী)

২

মাওলানা মাসউদুর রহমান
অনূদিত

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী™

সাহাবায়ে কেরামের ঈমানদীপ্ত জীবন (২)

মূল : ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা অনুবাদ : মাওলানা মাসউদুর রহমান
১ম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৮, ২য় মুদ্রণ : মার্চ ২০১৯ প্রচ্ছদ : মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম
মুদ্রণ : শাহারিয়ার প্রিন্টিং প্রেস, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা-১১০০।
বাঁধাই : আয়েশা বুক বাইন্ডিং, সূত্রাপুর, ঢাকা। ০১৯৭৯-১০৩ ৭৪০

একমাত্র পরিবেশক : **রাহনুমা প্রকাশনী,** ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
যোগাযোগ : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯

অনলাইন পরিবেশক : www.rokomari.com/rahnuma
অর্ডার করতে : ০১৫১৯-৫২১৯৭১/১৬২৯৭

মূল্য : ৮০০/- (আটশো টাকা মাত্র)

SAHABAYE KERAMER EMANDIPTO JIBON (2nd Issue)
Writer: Dr. Abdur Rahman Rafat Pasha, Translated by- Mawnala Maswoodur Rahman,
Published by: Rahnuma Prokashoni, Price: Tk. 800.00, US $ 25.00 only.

ISBN 978-984-93221-7-7
Web: www.rahnumabd.com, E-mail: rahnumaprokashoni@gmail.com

অর্পণ–

পাবনা জামেয়া আশরাফিয়ার
বড় হুযুর
হাফেজ মাওলানা মুহাম্মাদ নেয়ামতুল্লাহ দা. বা.-এর
মুবারক হাতে।

যিনি তিলে তিলে নিজের জীবনের
সবশক্তি নিংড়ে দিয়ে
গড়ে তুলেছেন জামেয়া আশরাফিয়া।

অনুবাদকের কিছু কথা

আল্‌হামদুলিল্লাহ,
অসংখ্য আগণিত শুকরিয়া মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য নিবেদন করছি, যিনি আপন করুণার আঁচলে ঢেকে এই নগণ্যকে *সাহাবায়ে কেরামের ঈমানদীপ্ত জীবন* দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ সম্পূর্ণ করার তাওফীক দিয়েছেন।

মূল আরবী কিতাব *সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা* দ্বিতীয় খণ্ডটি সম্পূর্ণ নতুন ৪৩টি জীবনী নিয়ে ডক্টর রাফাত পাশা রহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তেকালের পরে প্রকাশিত হয়েছিল।

বাংলা অনুদিত গ্রন্থে উভয় খণ্ডের কলেবর একরকম রাখার ইচ্ছায় উভয় খণ্ডে ৫৪টি করে জীবনী ভাগ করে দেওয়া হয়েছে।

রাহনুমা প্রকাশনী—যা রুচিশীল ইসলামী প্রকাশনার জগতে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, আমার অন্য বইগুলোর মতো এটাও খুবই চমৎকারভাবে উন্নত কাগজ, ঝকঝকে ছাপা, মজবুত বাঁধাই এবং দৃষ্টিনন্দন প্রচ্ছদে সাজিয়ে পাঠকের হাতে তুলে দিচ্ছে দেখে আমি খুবই তৃপ্ত। আশা করি পাঠকরাও আনন্দ পাবেন এবং তৃপ্ত হবেন; ইনশাআল্লাহ।

একজন মুমিনের জন্য মহান সাহাবীদের বিষয়ে মৌলিক কিছু ধারণা রাখা অতি জরুরি। সেই জরুরি বিষয়গুলো প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। পাঠকের প্রতি বিনীত অনুরোধ সেটা ভালোভাবে পড়ে নেবেন।

বইটিকে সর্বাঙ্গিন সুন্দর ত্রুটিমুক্ত করার জন্য অনুবাদক এবং রাহনুমা পরিবার চেষ্টায় কোনো ত্রুটি করেনি। এরপরও ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়, বরং মানুষ হিসাবে সেটাই স্বাভাবিক। কারো চোখে কোনো ভুল বা অসঙ্গতি ধরা পড়লে আমাদেরকে জানালে কৃজ্ঞতার সঙ্গে পরবর্তীতে সংশোধন করে দেওয়া হবে; ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে রাব্বুল আলামীনের দরবারে প্রার্থনা জানাই, সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ জীবন থেকে আমরা যেন শিক্ষা নিতে পারি, আদর্শ জীবন গড়তে পারি, জাহান্নাম থেকে মুক্তির পাথেয় সংগ্রহ করতে পারি। আল্লাহ সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

ওয়াস সালাম–

মাসউদুর রহমান
কমলাপুর, কুষ্টিয়া

২৯ যিলহজ ১৪৩৯ হি.
৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি.

ডক্টর আবদুর রহমান রাফাত পাশা
রহমাতুল্লাহি আলাইহি

জন্ম ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে।

জন্মস্থান সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলের ‘আরীহা’ শহর। সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষা।

মাধ্যমিক শিক্ষা ‘হলব’ শহরের খসরুবিয়া বিদ্যালয় থেকে। উচ্চ মাধ্যমিক ডিগ্রী মিশর আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘উসূলুদ্দীন’ (ধর্ম) অনুষদ থেকে। সব শেষে কায়রো ইউনিভার্সিটি থেকে আরবী সাহিত্যে অনার্স, মাস্টার্স ও পি.এইচ.ডি.।

কর্মজীবনের শুরু শিক্ষক হিসাবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে সিরিয়ার শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আরবী ভাষার প্রধান পরিদর্শক (Inspector)। তারপর দামেস্কের ‘দারুল কুতুব’ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পাশাপাশি দামেস্ক ইউনিভার্সিটির কলা অনুষদের প্রভাষক।

সৌদি আরবের ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা। এখানে ইসলামী সাহিত্য কারিকুলাম এবং ‘অলঙ্কার ও সমালোচনা’ বিভাগের চেয়ারম্যান, ‘মজলিসে ইল্‌মী’র (শিক্ষা পরিষদ) আজীবন সদস্য ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও প্রকাশনা পর্ষদ প্রধানের দায়িত্ব পালন।

মরহুম ড. আবদুর রহমান ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির উদ্বোধক নন, বহু চিন্তাশীল, গবেষক তাঁর পূর্বেও এ কাজ করেছেন... তবে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন পূর্বসূরিদের স্বপ্নের বাস্তবায়ন ও স্বার্থক রূপায়ন ঘটাতে। সাহিত্য ও সমালোচনার ক্ষেত্রে একমাত্র তিনিই ফুটিয়ে তুলেছিলেন পরিপূর্ণ ইসলামী ভাবধারা।

তিনি সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর সভাপতিত্বে *রাবেতা আল-আদাবুল ইসলামী*'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এর সহ-সভাপতি। এছাড়াও বহু সংস্থা ও কমিটির তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় সদস্য।

মৃত্যু ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জুলাই শুক্রবারে তুর্কিস্তানের ইস্তাম্বুল শহরে। তাঁকে দাফন করা হয় সেখানেরই 'ফাতেহা' গোরস্থানে। যেখানে সমাহিত রয়েছেন অনেক সাহাবী ও তাবেঈ। জীবদ্দশায় যাঁদের তিনি সর্বাধিক ভালোবাসতেন এবং যাঁদের পাশে একটু স্থান পাওয়ার ব্যাকুল প্রার্থনা করতেন মহান প্রভুর দরবারে। আল্লাহ সেই প্রার্থনা কবুল করে পৃথিবীতেই তাঁর মৃতদেহকে স্থান দিয়েছেন মহান সাহাবী ও তাবেঈদের কবরের পাশে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরবারে আমাদের প্রার্থনা—চিরস্থায়ী জান্নাতেও তাঁকে তাঁদের সঙ্গী বানিয়ে দিন। আমীন।

সূচিপত্র

সাবেত ইবনে কায়েস আল-আনসারী—১৭
তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ আত-তাইমী—২৭
আবু হুরাইরা আদ-দাউসী—৪১
সালামা ইবনে কায়েস আল-আশজাঈ—৫৭
মুআয ইবনে জাবাল—৬৯
ইয়াসির পরিবার
ইয়াসির, সুমাইয়া ও আম্মার—৮২
সুহাইল ইবনে আমর—৯৫
জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আল-আনসারী—১০৭
সালিম মাওলা আবী হুযাইফা—১১৭
আমর ইবনুল আস—১২৪
আবু লুবাবা—১৪৪
আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা—১৫৪
জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজালী—১৬৭
উবাই ইবনে কাআব আল-আনসারী—১৭৮
মাইসারা ইবনে মাসরূক আল-আব্‌সী—১৯১
হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব—২০২
আবু আকীল আল-আকীকী—২১৬
সাঈদ ইবনুল আস—২২৭
জুলাইবীব—২৩৮

সাআদ ইবনে মুআয—২৪৭
শাদ্দাদ ইবনে আউস আল-আনসারী—২৫৯
আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর—২৬৯
কা'কা' ইবনে আমর—২৮০
'খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের সঙ্গে'
কা'কা' ইবনে আমর—২৯৪
কাদেসিয়া রণাঙ্গনে (এক)
কা'কা' ইবনে আমর—৩০২
কাদেসিয়া রণাঙ্গনে (দুই)
আবূ উবাইদ ইবনে মাসউদ আস-সাকাফী—৩১২
যুবাইর ইবনুল আওয়াম—৩২৪
সিমাক ইবনে খারাশা—৩৩৭
খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ—৩৪৬
আল-মুসান্না ইবনে হারেসা আশ-শাইবানী—৩৬১
আবু বাসীর উতবা ইবনে আসীদ—৩৭১
আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ইবনুল খাত্তাব—৩৮২
তুলাইহা ইবনে খুওয়াইলিদ আল-আসাদী—৩৯৭
উবাদা ইবনুস সামিত—৪১০
ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ান—৪২১
আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব—৪৩১
আনাস ইবনুন্ নযর আন-নাজ্জারী—৪৪৩
রাফি ইবনে উমাইর আততাঈ—৪৫৩
উসমান ইবনে মাযউন—৪৬৭
কাআব ইবনে মালিক—৪৭৯

তামীম আদ-দারী—৪৯২
আল-আলা ইবনুল হাযরামী—৫০১
আল-আলা ইবনুল হাযরামী (দুই)—৫১১
আল-আলা ইবনুল হাযরামী—৫২১
সাগরের যুদ্ধে
মুগীরা ইবনে শু'বা—৫২৯
আমর ইবনুল জামূহের দুই পুত্র
মুআয এবং মুআউওয়ায—৫৪০
মুসআব ইবনে উমাইর—৫৫১
আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক—৫৬২
আল-মিকদাদ ইবনে আমর—৫৭৩
আমর ইবনে উমাইয়া আয-যমরী—৫৮৬
উসমান ইবনে আফ্‌ফান—৫৯৬
সালামা ইবনুল আকওয়া—৬১৪
যায়েদ ইবনে সুউনা—৬২৪
ছয়জন সাহাবীর অবিস্মরণীয় শাহাদাত—৬৩৪

ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা

সাহাবায়ে কেরামের ঈমানদীপ্ত জীবন

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম)

সাবেত ইবনে কায়েস আল-আনসারী

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

সাবেত ইবনে কায়েস আল-আনসারী ছাড়া আর কারোরই মৃত্যুর পরের অসিয়ত কার্যকর করা হয়নি।

সাবেত ইবনে কায়েস আল-আনসারী ছিলেন 'খাযরাজ' গোত্রের একজন বিখ্যাত নেতা। ছিলেন ইয়াসরিবের একজন বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধা ও উপস্থিতবুদ্ধির অধিকারী। ভরাট গলার, দরাজ আওয়াজের আকর্ষণীয় বক্তা। কথা শুরু করলে সকলের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠে তাঁর কথা, আর বক্তব্য দিতে উঠলে সকলের হৃদয়, মন ও মনোযোগ সবটুকু আকৃষ্ট হয়ে থাকে তার প্রাঞ্জল বক্তব্যে।

ইয়াসরিবের জমিনে ইসলাম গ্রহণকারী অগ্রগামীদের তিনি অন্যতম। ইসলামের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন কুরআনের তিলাওয়াত শুনে। ইয়াসরিবের উদ্দেশে প্রেরিত ইসলামপ্রচারক মক্কার তরুণ মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মধুর কণ্ঠের সুললিত তিলাওয়াত তাকে মুগ্ধ করে। তারপর তিনি তন্ময় হয়ে বারবার শুনতে থাকেন কুরআনের অপূর্ব উপদেশমাখা আয়াতগুলো। কুরআনের অশ্রুতপূর্ব বক্তব্য ও ভাষাশৈলী, জাদুমাখা শব্দালংকার তার হৃদয়ে তোলে সুরের ঝংকার। কুরআনের আকর্ষণীয় ও চমৎকার বর্ণনাভঙ্গি, আদেশ-নিষেধ ও

দিকনির্দেশনা তার হৃদয়ে সৃষ্টি করে এক কালবৈশাখী ঝড়—যা তছনছ করে দেয় দীর্ঘদিনের লালিত চেতনা ও বিশ্বাস।

আল্লাহ তাআলা তার হৃদয়ের বদ্ধ দুয়ার উন্মুক্ত করে দেন ঈমান গ্রহণের জন্য। ইসলামের পতাকাতলে, সত্য দীনের আলোর কাফেলায় শামিল করে তিনি তার মর্যাদাকে করে তোলেন সমুন্নত।

***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় এলে সাবেত ইবনে কায়েস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজ কওমের একদল অশ্বারোহী বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে তাকে জানান উষ্ণ অভ্যর্থনা। রাসূল ও তাঁর সঙ্গী আবু বকর সিদ্দীকের শুভাগমন উপলক্ষে তিনি চমৎকার এক স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। যথারীতি শুরুতে মহান আল্লাহর হামদ ও সানা এবং প্রিয় নবীর ওপর দরূদ ও সালাম পাঠের পর তিনি আবেগময় বক্তব্যের সমাপ্তিতে এসে বলেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা প্রতিজ্ঞা করছি, সর্বশক্তি দিয়ে আপনার হেফাজত করব ঠিক যেভাবে আমরা নিজেদের স্ত্রী, সন্তান ও নিজ নিজ জীবনের হেফাজত করে থাকি। ইয়া রাসূলাল্লাহ, এর বিনিময়ে আমরা কী পাব?

এর জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

'এই মহান ত্যাগের বিনিময় হিসাবে তোমরা পাবে 'জান্নাত'।'

প্রিয় নবীর জবান মুবারক থেকে 'জান্নাত'-এর বিশাল প্রতিশ্রুতি শোনামাত্রই উপস্থিত সকলের হৃদয়-মন আনন্দে নেচে ওঠে। তাদের চোখে-মুখে সেই প্রচণ্ড খুশির ঝলক বয়ে যায়। এত বড় বিশাল প্রতিদানের ঘোষণা শুনে তারা একসঙ্গে বলে ওঠেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা এই প্রতিদানে রাজি আছি।

হে আল্লাহর রাসূল, আমরা এই প্রতিশ্রুতিতে সন্তুষ্ট আছি।'

সেদিন থেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবেত ইবনে কায়েস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে নিযুক্ত করলেন নিজের 'মুখপাত্র'। দাঁতভাঙা জবাব দেওয়ার জন্য তিনি নির্দেশ দিতেন নিজের কবি হাস্সান ইবনে সাবেতকে। যিনি দাঁড়িয়ে প্রতিপক্ষের কাব্য প্রতিভায় গর্বকারীদেরকে কবিতার মাধ্যমে তুলোধোনা করে শ্রেষ্ঠনবীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতেন।

***

সাবেত ইবনে কায়েস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন সুদৃঢ় ও সুগভীর ঈমানী চেতনায় বলিষ্ঠ বিরল ব্যক্তিত্ব। আল্লাহর ভয় অর্থাৎ খাঁটি তাকওয়া ও পরহেজগারির গুণ ছিল তাঁর হৃদয়ভরা। মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক যাবতীয় বিষয় থেকে তিনি নিজেকে সরিয়ে রাখতেন বহুদূরে।

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ভীষণ চিন্তিত ও বিষণ্ন দেখে জিজ্ঞাসা করলেন,

'হে আবু মুহাম্মাদ, (সাবেত ইবনে কায়েস) কী হয়েছে তোমার? এত চিন্তিত কেন?'

চিন্তিত আওয়াজে তিনি জবাব দিয়ে বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আমি আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি এবং হয়তো নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে ঠেলে দিয়েছি।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার জিজ্ঞাসা করলেন,

'কীভাবে সেটা?'

তিনি বললেন,

'আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিজের প্রশংসায় খুশি হতে এবং নিজের প্রশংসা পছন্দ করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন, অথচ আমি

দেখতে পাচ্ছি যে, কেউ আমার প্রশংসা করলে আমি খুশি হই। মজা পাই। আল্লাহ তাআলা 'তাকাব্বুর' (অন্যের তুলনায় নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করা) করতে বারণ করেছেন। অথচ আমি তো মনে মনে নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবি। নিজেকে পছন্দ করি...'

এভাবে সাবেত ইবনে কায়েস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজের ভয় ও আশঙ্কার কথা বলতে থাকেন আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আশ্বস্ত করতে থাকেন। তাকে অভয় দিতে গিয়ে এক সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

'হে সাবেত, তুমি কি খুশি হবে না, যদি তোমার জীবন হয় প্রশংসনীয়...

মৃত্যু হয় শাহাদাতের...

মৃত্যুর পর ঠিকানা হয় জান্নাতে?'

এই বিরাট সুসংবাদে সাবেত রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর চেহারা খুশিতে ঝলমল করে ওঠে। এর জবাবে তিনি বলেন,

'কেন খুশি হব না ইয়া রাসূলাল্লাহ!

অবশ্যই আমি খুশি ইয়া রাসূলাল্লাহ!'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

'তোমার জন্যই ঐ সুসংবাদ।'

***

যখন পবিত্র কুরআনের এই আয়াত নাজিল হলো,

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা নবীর আওয়াজের চেয়ে তোমাদের আওয়াজকে উঁচু কোরো না এবং তার সামনে উচ্চৈঃস্বরে কথা বোলো না,

যেমন একে অন্যের সঙ্গে বলে থাকো। হতে পারে এতে তোমাদের আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে, অথচ তোমরা জানতেও পারবে না।’-সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ২

এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর সাবেত ইবনে কায়েস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলের প্রতি প্রচণ্ড ভক্তি-ভালোবাসা সত্ত্বেও তাঁর মজলিসে হাজির হওয়া ছেড়ে দিলেন। সারাক্ষণ নিজ বাড়িতেই নিজেকে আবদ্ধ করে রাখতে শুরু করলেন। শুধু ফরজ নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে হাজির হতেন। এ ছাড়া অবশিষ্ট সকল সময় বাড়িতেই একাকী বিষণ্ন মনে পড়ে থাকতেন।

বেশ কয়েকদিন তার অনুপস্থিতির পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মজলিসে ঘোষণা করলেন,

‘কে আছে, যে আমাকে সাবেত ইবনে কায়েসের খবর এনে দিতে পারবে?’

এক আনসারী উঠে বললেন,

‘ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনাকে তার খবর এনে দিতে পারব।’

লোকটি যথারীতি সাবেত ইবনে কায়েসের বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন। দেখলেন, তিনি বিষণ্ন মনে মাথা নিচু করে বসে আছেন। আনসারী লোকটি জিজ্ঞাসা করলেন,

‘হে আবু মুহাম্মাদ, আপনি কেমন আছেন?’

তিনি সংক্ষেপে ভূমিকা ছাড়াই জবাবে বললেন,

‘খুব খারাপ।’

লোকটি এবার একটু ব্যাখ্যা চেয়ে বললেন,

‘কেন? কী হয়েছে?’

তিনি বললেন,

‘দেখো, আমার গলার আওয়াজ সকলের চেয়ে উঁচু। এতে করে নিশ্চয় অনেক সময় রাসূলের আওয়াজের ওপরে আমার আওয়াজ উঁচু

হয়ে গেছে। এ বিষয়ে কুরআনে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, তার কারণে আমি ভীষণভাবে শঙ্কিত, হয়তো আমার সকল আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে আর আমি জাহান্নামী লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি।'

লোকটি রাসূলের কাছে ফিরে এসে নিজের দেখা ও শোনা সকল বিষয় জানালেন। সকল বিষয় অবগত হয়ে তিনি লোকটিকে বললেন,

'তুমি তার কাছে আবার যাও। গিয়ে বলো, তুমি জাহান্নামী লোকদের অন্তর্ভুক্ত নও; বরং তুমি জান্নাতী লোকদের একজন।'

এটাই ছিল সাবেত ইবনে কায়েস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জন্য জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সুসংবাদ, সারা জীবন তিনি কামনা করেছেন, যেন এর সুফল লাভ করতে পারেন দুনিয়া ও আখেরাতে।

***

সাবিত ইবনে কায়েস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একমাত্র বদর যুদ্ধ ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হক-বাতিলের সকল লড়াইয়ে শরীক হয়েছেন। শাহাদাতের স্বপ্নপূরণের আকাঙ্ক্ষায় সকল যুদ্ধেই তিনি জীবনের মায়া ত্যাগ করে শত্রুসৈন্যের সারি ভেদ করে দুঃসাহসী হয়ে লড়াই করেছেন। কিন্তু প্রতিবারেই তিনি স্বপ্নপূরণের একেবারে দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেলেও ব্যর্থ হয়েই ফিরে এসেছেন। কাঙ্ক্ষিত শাহাদাতকে স্পর্শ করতে পারেননি।

অবশেষে তাঁর সেই শাহাদাতের স্বপ্ন পূরণ হলো প্রথম খলীফা আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শাসনামলে ভণ্ড নবী মুসাইলামা ও মুসলিম বাহিনীর মাঝে সংঘটিত 'রিদ্দা'র যুদ্ধে।

এই যুদ্ধে তিনি ছিলেন আনসার সৈনিকদের আমীর ও সিপাসালার আর আবু হুযাইফার আযাদকৃত ক্রীতদাস সালিম ছিলেন মুহাজির সৈনিকদের আমীর ও সিপাসালার। আর মুহাজির, আনসার ও বেদুঈনসহ সকল দলের সর্বাধিনায়ক বা প্রধান সেনাপতি ছিলেন ইতিহাসের অন্যতম সেরা বীর খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

যুদ্ধের শুরু থেকেই রণাঙ্গনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল মুসাইলামা ও তার শক্তিশালী বাহিনীর দাপট। বিজয়ের পাল্লাও ঝুঁকে ছিল তাদেরই দিকে। মুসলিম বাহিনীর চরম শোচনীয় অবস্থার সুযোগে মুসাইলামার বাহিনী সেনাপতি খালিদের তাঁবুতে আক্রমণ করে বসল। তারা মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধ পরিচালনার কেন্দ্র (যুদ্ধের হেড অফিস) এই তাঁবুর সকল রশি ছিঁড়ে সবকিছু একেবারে তছনছ করে ফেলল। সেনাপতির স্ত্রী ‘উম্মে তামীম’কে হত্যার উদ্যোগ নিয়েও শেষ পর্যন্ত ‘নারীহত্যা কাপুরুষতা’র প্রচলিত রীতির কথা চিন্তা করে বিরত হলো।

সেই দিন সাবেত ইবনে কায়েস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুসলিম বাহিনীর দুর্দশা ও বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখে ভীষণ ব্যথিত ও বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি সর্বাধিক বিচলিত হলেন যখন দেখলেন, শহুরে যোদ্ধারা মরুবাসীদের ভীরু আর মরুচারী বেদুঈন যোদ্ধারা শহুরে যোদ্ধাদের অনভিজ্ঞ বলে দোষারোপ করছে।

মুসলিম বাহিনীর বিশৃঙ্খলা ও পারস্পরিক দোষারোপের কারণে সাবেত ইবনে কায়েস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কাফনের কাপড় পরে মৃত ব্যক্তির মতো শরীরে কর্পূর মেখে দরাজ গলায় সকলকে সম্বোধন করে বললেন,

‘প্রিয় মুসলিম সৈনিক ভাইয়েরা!

আজকের রণাঙ্গনে বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা দেখে আমি ভীষণ ব্যথিত ও ভারাক্রান্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় কোনো রণাঙ্গনেই মুসলিম সৈনিকদের এমন লজ্জাজনক বিপর্যয় আমি দেখিনি।

মুসলিম সৈনিকদের বিরুদ্ধে শত্রুবাহিনী আজ পর্যন্ত এমন দুঃসাহস দেখাতে পারেনি। অথচ তোমাদের অনৈক্য, পারস্পরিক দোষারোপ ও ভীরুতা আজ শত্রুদের এতখানি দুঃসাহসী ও উল্লসিত করে তুলেছে।

শত্রুবাহিনীর এতবড় দুঃসাহস আর নিজেদের বিপর্যয় কি তোমরা স্বাভাবিকভাবে মেনে নিচ্ছ? আমি কিছুতেই এই বিপর্যয় মেনে নিতে পারব না।’

এরপর তিনি ওপরে আকাশের দিকে দৃষ্টি উঠিয়ে বললেন,

'হে আল্লাহ, আমি এই মুসাইলামা ও তার মুরতাদ বাহিনীর রিদ্দতের ফিতনা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ঘোষণা করছি, একই সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে আজকের এই প্রতিরোধযুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর দুর্বলতা থেকেও নিজেকে সম্পর্কহীন ঘোষণা করছি।'

এই ঘোষণার পর তিনি প্রথম পর্যায়ে ইসলাম কবুলকারী কয়েকজন মুসলিম সৈনিক—বারা ইবনে মালেক আল-আনসারী, আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাবের ভাই যায়েদ ইবনুল খাত্তাব এবং আবু হুযাইফার আযাদকৃত দাস সালিম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শত্রুবাহিনীর ওপর আহত সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং এমন ভয়াবহ লড়াই করতে থাকলেন, যা দেখে মুসলিম সৈনিকদের হৃদয়ে হারানো সাহস ও আত্মবিশ্বাসের আগুন জ্বলে উঠল আর শত্রু মুরতাদ বাহিনীর অন্তরে সৃষ্টি হলো ভীতি, ত্রাস আর কম্পন।

অব্যাহত তুমুল আক্রমণের মাধ্যমে তিনি শত্রুবাহিনীর সকল দিকের সার্বিক প্রতিরোধব্যবস্থা ভেঙে চুরমার করে দিলেন। অসংখ্য তির, তরবারি ও বর্শার মরণঘাতী আঘাত বুক পেতে নিয়েও শত্রুবাহিনীর বুকে কাঁপন সৃষ্টি করে এক সময় তিনি অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে নিস্তেজ হয়ে পড়ে গেলেন। অন্তিম মুহূর্তে সেই শাহাদাতের স্বপ্ন পূরণের আনন্দে তাঁর চোখ জুড়িয়ে গেল, যার সুসংবাদ তাকে দিয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রাণপাখি দেহ ত্যাগ করার পূর্বেই তার হৃদয় শীতল ও প্রশান্ত হয়ে উঠল মুসলিম বাহিনীর বিজয়ের সূচনা দেখে, যা ছিল একান্ত তার উদ্যোগ আর কুরবানীর ফসল।

***

সাবেত ইবনে কায়েস আল-আনসারীর দেহে ছিল চমৎকার ও লোভনীয় একটি বর্ম। সেদিক দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় এক মুসলিম সৈনিক সেটা দেখে লোভ সংবরণ করতে না পেরে খুলে নিয়ে সরে পড়ল।

সাবেত ইবনে কায়েস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যেদিন শহীদ হলেন সেই দিনের পরবর্তী রাতেই একজন সাধারণ মুসলিম স্বপ্নে দেখলেন, সাবেত ইবনে কায়েস তাকে বলছেন,

‘তুমি কি আমাকে চিনতে পেরেছ? আমি সাবেত ইবনে কায়েস।’

লোকটি উত্তরে বললেন,

‘জি, আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি। কী খবর, বলুন!’

তিনি বললেন,

‘আমি তোমার কাছে খুব জরুরি একটি অসিয়ত করব। কিন্তু খবরদার! তুমি এটাকে স্বপ্নে দেখা কোনো সাধারণ ব্যাপার মনে করে ভুলে যেয়ো না।...

বিষয়টি এই, গতকাল শহীদ হওয়ার পর আমার মৃতদেহের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এক মুসলিম সৈনিক আমার দামি বর্মটি শরীর থেকে খুলে নিয়ে যায়। বর্মটি নিয়ে সেনাছাউনির একেবারে শেষপ্রান্তে অবস্থিত নিজের তাঁবুতে নিয়ে একটি ডেগের মধ্যে রেখে সেটাকে জিনপোষ দিয়ে ঢেকে রেখেছে। লোকটির বিবরণ এই রকম...

শোনো, সকালে তুমি আমাদের প্রধান সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের কাছে গিয়ে বলবে, তিনি যেন কাউকে পাঠিয়ে আমার বর্মটি উদ্ধার করেন। সেটা এখনো বর্ণিত ডেগের মধ্যেই আছে।

তোমাকে আরও একটি জরুরি অসিয়ত করছি, খবরদার! এটাকে সাধারণ স্বপ্ন মনে করে অবহেলায় ভুলে যেয়ো না।...

তুমি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের কাছে আমার এই অনুরোধ ও অসিয়ত পৌঁছে দেবে যে, মদীনায় গিয়ে খলীফা আবু বকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি যেন তাকে জানিয়ে দেন, সাবেত ইবনে কায়েসের ঘাড়ে এই পরিমাণ ঋণের বোঝা রয়েছে, আর অমুক অমুক নামে আমার দু’জন ক্রীতদাস রয়েছে। খলীফা যেন আমার ক্রীতদাস দু’জনকে মুক্ত করে দেন এবং আমার বর্মটি বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করে দেন।’

ঘুম ভাঙার পর সকালে লোকটি স্বপ্নের নির্দেশনামতো গিয়ে হাজির হলেন সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের কাছে। সবিস্তারে তাঁর কাছে স্বপ্নের বৃত্তান্ত জানালেন।

স্বপ্নের পূর্ণ বিবরণ শোনার পর খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সাবেত ইবনে কায়েস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বর্মটি উদ্ধার করার জন্য লোক পাঠালেন। লোকটি গিয়ে যথারীতি বর্ণিত স্থান থেকে বর্মটি উদ্ধার করে ফিরে এলেন।

সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রণাঙ্গন থেকে মদীনায় ফেরার পর খলীফার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তাঁর কাছে যথারীতি সাবেত ইবনে কায়েসের অসিয়তসংক্রান্ত বিস্তারিত বিষয় আলোচনা করলেন। সকল বিষয় অবগত হওয়ার পর খলীফা সরকারি ফরমান জারি করে সাবেত ইবনে কায়েসের অসিয়ত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন।

এটাই ছিল একমাত্র ব্যতিক্রমী ঘটনা যেখানে কারো মৃত্যুর পরে করা অসিয়ত কার্যকর করা হয়েছিল। সাবেত ইবনে কায়েস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আগে বা পরে কখনোই আর কারোর মৃত্যুর পরের অসিয়তকে আমলযোগ্যই বিবেচনা করা হয়নি।

আল্লাহ তাআলা সাবেত ইবনে কায়েস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি আপন সন্তুষ্টি দান করুন। তাকেও তুষ্ট করে দিন আপন প্রভুর প্রতি আর জান্নাতের উঁচু স্তরে তার স্থান নির্ধারণ করে দিন। আমীন।

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা; *আত্তারজামা*, ৯০৪।
২. *আল-ইসতীআব* (*আল-ইসাবার* টীকা), ১ম খণ্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা।
৩. *তাহযীবুত তাহযীব*, ২য় খণ্ড, ১২ পৃষ্ঠা।
৪. *ফাতহুল বারী*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪০৫ পৃষ্ঠা।
৫. *তারীখুল ইসলাম লিযযাহাবী*, ১ম খণ্ড, ৩৭১ পৃষ্ঠা।
৬. *হায়াতুস সাহাবা*, ৪র্থ খণ্ডের সূচি দ্রষ্টব্য।
৭. *আল-বায়ান ওয়াত্তাবয়ীন*, ১ম খণ্ড, ২০১ ও ৩৫৯ পৃষ্ঠা।
৮. *সীরাতু ইবনি হিশাম*, ২য় খণ্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা, ৩য় খণ্ড, ৩১৮ পৃষ্ঠা, ৪র্থ খণ্ড, ২০৭ পৃষ্ঠা।
৯. *আস সিদ্দীক লি হুসাইন হাইকাল*, ১৬০ পৃষ্ঠা।
১০. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*।
১১. *উসদুল গাবাহ*, ১ম খণ্ড, ২৭৫ পৃষ্ঠা; অথবা *আত্তারজামা*, ৫৬৯।

তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ আত-তাইমী

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

প্রকৃতপক্ষে শাহাদাতপ্রাপ্ত—শহীদ, অথচ জমিনের ওপর চলমান—এমন ব্যক্তিকে দেখে যদি কেউ খুশি হতে চায়, সে যেন তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহকে দেখে।

–মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ

তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ আত-তাইমী কুরাইশী এক বাণিজ্য-কাফেলার সঙ্গে যাচ্ছিলেন শাম দেশের উদ্দেশে। কাফেলা যখন সিরিয়ার বাণিজ্যকেন্দ্র বুসরা (ইরাকের বাণিজ্য-বন্দর 'বসরা' নয়) এসে পৌঁছল তখন কুরাইশের পোড়-খাওয়া ঝানু ঝানু ব্যবসায়ীরা সেখানে ব্যস্ত বাজারে ঢুকে কেনাবেচা শুরু করে দিলেন।

তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ যদিও ছিলেন অল্পবয়সী তরুণ এবং ব্যবসায় তার ছিল না কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা, তথাপি তার তীক্ষ্ণ মেধা ও দূরদর্শিতার কারণে এমনভাবে কেনাবেচা করলেন—যা তাকে অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার সুযোগ করে দেয়। শুধু তা-ই নয়, বরং ব্যবসায় তিনি ঝানু ব্যবসায়ীদের চেয়েও বেশি মুনাফা করতে সক্ষম হন।

তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ এই সরগরম ও ব্যস্ত বাণিজ্যকেন্দ্রে সকাল-বিকাল আসা-যাওয়ার কালে একবার তার সামনে ঘটল এমন এক আশ্চর্য

ঘটনা যা শুধু কেবল তার জীবনের সম্পূর্ণ গতিধারা পাল্টে দেওয়ারই উপলক্ষ হলো না; বরং ঘটনাটি সাব্যস্ত হলো গোটা ইতিহাসেরই গতিধারা পাল্টে দেওয়ার শুভ ইঙ্গিতবাহক।

চলুন, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ আত-তাইমীর জবানিতে শোনা যাক সেই চমৎকার ও অবিস্মরণীয় কাহিনি।

***

তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ বলেন,

'আমরা 'বুসরা' বাণিজ্যকেন্দ্রেই ছিলাম, হঠাৎ দেখতে পেলাম একজন খ্রিষ্টান পাদরি চিৎকার করে ব্যবসায়ীদের বলছেন, 'এই বিশাল জনতার মাঝে কি মক্কার হারামে বসবাসকারী কেউ আছেন?'

আমি ছিলাম তার একেবারেই নিকটে, ফলে দ্রুত তার নিকট এগিয়ে গিয়ে বললাম,

'জি, আমি আছি হারামের অধিবাসী।'

তিনি আমার জবাব শুনে জিজ্ঞাসা করলেন,

'তোমাদের মাঝে কি 'আহমাদ'-এর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে?'

আমি বললাম,

'এই 'আহমাদ'টা আবার কে?'

তিনি বললেন,

'তিনি হচ্ছেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র। এটাই সেই পবিত্র মাস—যাতে তাঁর আত্মপ্রকাশের কথা। আর তিনিই হবেন আখেরী পয়গম্বর। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তিনি তোমাদেরই জন্মভূমি হারামের পবিত্র মক্কা নগরীতেই জন্মগ্রহণ করবেন। এরপর তিনি হিজরত করবেন কালো পাথরবিশিষ্ট এবং খেজুরবাগান শোভিত এমন ভূমিতে—যার উপরিভাগ লবণাক্ত কিন্তু নিম্নভাগের সুমিষ্ট ও সুপেয় পানি ওই বাগানগুলোকে সজীব করে রাখে।

হে তরুণ, সাবধান তাঁর কাছে পৌঁছতে তুমি যেন অন্যদের চেয়ে পিছে পড়ে যেয়ো না।'

তালহা বলেন,

'খ্রিষ্টান পাদরির আবেগজাগানো কথাগুলো আমার হৃদয়ের গভীরে খুব রেখাপাত করল। ফলে এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে আমি ছুটে চলে গেলাম আমার উটপালের কাছে। উটের পিঠে হাওদা বেঁধে প্রস্তুত হয়ে গেলাম। সঙ্গী কাফেলার কাউকে কিছু না বলেই দ্রুতগতিতে অবিরাম চলতে লাগলাম মক্কার উদ্দেশে।

মক্কায় পৌঁছার পর আমার পরিবারের লোকদের জিজ্ঞাসা করলাম,

'আমরা মক্কা ছেড়ে যাওয়ার পর এখানে নতুন কিছু কি ঘটেছে?'

তারা বলল,

'হ্যাঁ, একটি নতুন বিষয় এখানে ঘটেছে। আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ দাবি করছেন যে, তিনি আল্লাহর প্রেরিত নবী। এরই মধ্যে আবু বকর ইবনে আবু কুহাফা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছেন এবং তাঁর অনুসারী হয়েছেন।'

তালহা বলেন,

'আমি আগে থেকেই চিনতাম আবু বকরকে। কারণ, তিনি ছিলেন এমন একজন সহজ সরল মানুষ যিনি সবার সঙ্গে সহজভাবে মিশতেন। সবাই তাকে ভালোবাসত। খুবই কোমল স্বভাবের, দৃঢ়প্রত্যয়ী ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের একজন ব্যবসায়ী মানুষ হওয়ার কারণে আগে থেকেই আমি তাকে আপন মানুষ ভাবতাম। তার সঙ্গে চলাফেরা ও ওঠাবসা করতে পছন্দ করতাম। তার কাছে গেলে কুরাইশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, তাদের বংশলতিকা বা নসবনামা জানা যেত। কারণ, তিনি ছিলেন এসবের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। অতএব দেরি না করে আমি সোজা তার কাছেই হাজির হয়ে গেলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম,

'এটা কি সত্যি যে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ নিজেকে নবী হিসাবে দাবি করেছেন আর আপনি তাঁর প্রতি ঈমান এনেছেন?'

তিনি বললেন,
'হ্যাঁ, একদম সত্যি কথা।'

এরপর তিনি আমাকে রাসূল সম্পর্কে অনেক কিছু শোনালেন এবং ইসলাম কবুলের জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। তখন আমিও তাকে খ্রিষ্টান পাদরির বিষয়ে সব কথা খুলে বললাম। সব কথা শোনার পর তিনি বিস্মিত ও হতবাক হয়ে বললেন,

'তাহলে আর দেরি নয়, তুমি এখনই আমার সঙ্গে চলো। তুমি নিজেই এই কাহিনি নবী মুহাম্মাদকে বলবে এবং তাঁর কিছু বক্তব্য তুমি নিজ কানে শুনবে। সেটা হয়তো আল্লাহর দীন ইসলাম কবুলের ক্ষেত্রে তোমার জন্য সহায়ক হয়ে যাবে।'

তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ বলেন,
'আমি আর দেরি না করে আবু বকরের সঙ্গে নবী মুহাম্মাদের কাছে গিয়ে হাজির হলাম। তিনি আমার কাছে ইসলামের আদর্শ-সৌন্দর্য তুলে ধরলেন। কুরআনের কিছু আয়াতও শোনালেন। তিনি আমাকে ইসলাম গ্রহণ করলে দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণ লাভের সুসংবাদ জানিয়ে দিলেন।

আল্লাহ তাআলা আমার হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দিলেন। ইসলাম কবুল করার সিদ্ধান্ত ও সংকল্প আমি গ্রহণ করলাম। সেই মুহূর্তে আমি তার কাছে সিরিয়ার বাণিজ্যকেন্দ্র 'বুসরা'র সেই খ্রিষ্টান পাদরির পূর্ণ কাহিনিটি খুলে বললাম। তিনি এত খুশি হলেন যে, তাঁর নিষ্পাপ চেহারায় সেই খুশির ঝলক বয়ে গেল। এরপর আমি তাঁর সম্মুখে এক অদ্বিতীয় আল্লাহকে এবং মুহাম্মাদকে তাঁর মনোনীত রাসূল হিসাবে মেনে নেওয়ার ঘোষণা দিয়ে পড়ে নিলাম,

أَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা লা-শারিক, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁরই মনোনীত সত্য রাসূল।'

হযরত আবু বকরের মধ্যস্থতায় ইসলাম গ্রহণকারীদের মাঝে আমি ছিলাম চতুর্থ।'

***

কুরাইশী তরুণের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ তার আত্মীয়-পরিজন ও পরিবারের লোকজনের মাথায় বজ্রপাতের আঘাত হয়ে পতিত হলো। তার ইসলাম গ্রহণের সংবাদে সর্বাধিক ব্যথিত ও বিচলিত হলেন তার মা। তার মনে স্বপ্ন ছিল, একদিন এই ছেলে আপন কওমের নেতৃত্ব দেবে। কারণ, নেতৃত্বের উপযোগী মানবিক ও চারিত্রিক গুণাবলি এবং একজন নেতার মতো যোগ্যতা তার মাঝে পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল।

***

তার কওমের লোকজন ব্যস্ত হয়ে পড়ল তাকে নতুন ধর্ম-বিশ্বাস থেকে ফেরানোর জন্য। প্রথমে কোমল ভাষায়, সদাচরণের মাধ্যমে তাকে আবার মূর্তিপূজায় ফেরত আসার অনুরোধ করল। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। তিনি রয়ে গেলেন একেবারে পাহাড়ের মতো অটল ও অনড়। এভাবে যখন কিছুতেই তাকে ফেরানো গেল না, তখন তারা বেছে নিল নির্যাতন, শক্তিপ্রয়োগ ও শাস্তির পথ। নির্যাতন ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মাধ্যমে তাকে দমন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহর নির্মম নির্যাতনের দৃশ্য স্বচক্ষে দেখা মাসউদ ইবনে খারাশা বর্ণনা করেন,

'হজ ও উমরার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সাফা ও মারওয়ার সাঈ করার সময় আমি হঠাৎ দেখতে পেলাম, বেশ কিছু মানুষের জটলা একজন তরুণ যুবককে কেন্দ্র করে হই-হুল্লোড় করে এগিয়ে আসছে। যুবকটির দুই হাত গলার সঙ্গে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। জটলা পাকানো লোকগুলো পেছন থেকে তার মাথায় জোরে জোরে লাঠি দিয়ে পেটাচ্ছে। আবার পেছন থেকে তার পিঠে গুঁতা মেরে মেরে সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে

যাচ্ছে। পেছনে ছিল এক বুড়ি, সে চিৎকার করে যুকবটির প্রতি নানা রকমের অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছিল।...'

যুবকটির বিষয় জানার উদ্দেশ্যে আমি প্রশ্ন করলাম,
'কী হয়েছে এই যুবকের?'

উত্তরে তারা জানাল,
'এ হলো তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ। বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করে হাশেম গোত্রের মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে।'

আমি বললাম,
'এই মহিলাটি কে?'

তারা বলল,
'যুবকটির মা। সাবা বিনতুল হাযরামী।'

***

এরপর সামনে এল 'কুরাইশের সিংহ' বলে বিখ্যাত নওফাল ইবনে খুওয়াইলিদ। তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহকে একটি রশি দিয়ে শক্ত করে বাঁধল। আবু বকর সিদ্দীককেও আরেকটি রশি দিয়ে শক্ত করে বাঁধল। তারপর মক্কার নির্বোধ ও দুষ্ট লোকদের হাতে সঁপে দিয়ে বলল, 'দেখব, এই যুগলবন্দীকে তোমরা কতটা শাস্তি দিতে পারো।'

এই ঘটনা থেকেই আবু বকর এবং তালহাকে বলা হয় 'কারীনাইন' (যুগলবন্দী)।

***

সময়ের চাকা ঘুরতে থাকল। একের পর এক জীবনের ঘটনাপ্রবাহ ঘটেই চলল। সময়ের গতিধারা আর জীবনের বিভিন্নমুখী ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ পরিণত হয়ে উঠলেন পোড়-খাওয়া বিরল ব্যক্তিত্বে। আল্লাহ ও রাসূলের জন্য দুঃসহ সব

অগ্নিপরীক্ষা তিনি একটি একটি করে উতরে গেলেন। ইসলাম আর মুসলিম জাতির জন্য তার প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি বাড়তেই থাকল। ঈমান ও ইসলামী বিশ্বাসের জন্য তার অঙ্গীকার দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হলো। একপর্যায়ে মুসলিম জাতি তাকে 'জিন্দা শহীদ' (আশ্‌শাহীদুল হাই) উপাধিতে ভূষিত করল। খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র জবানে তালহার নামের সঙ্গে নানা রকম কল্যাণকর বিশেষণ যোগ করে কখনো ডাকলেন 'সর্বশ্রেষ্ঠ তালহা', 'মহান তালহা' আবার কখনো ডাকলেন 'দানবীর তালহা' নামে। তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহর এই সকল উপাধির প্রত্যেকটির পেছনেই রয়েছে খুবই চমৎকার ও বিস্ময়কর কাহিনি—যার কোনোটিই অন্যটির চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

***

'জিন্দা শহীদ' উপাধি দেওয়ার কাহিনি,

ওহুদ যুদ্ধের দিন। প্রথম পর্যায়ে মুসলিম বাহিনীর আক্রমণে মুশরিক বাহিনীর ময়দান ছেড়ে পলায়নাবস্থা দেখে যুদ্ধ শেষ মনে করে মুসলিম মুজাহিদগণ যার যার অবস্থান থেকে সরে পড়েন। তাদের এমন অসতর্ক ও এলোমেলো অবস্থায় মুশরিকদল পেছন থেকে ফিরে এসে অতর্কিত মুসলিম বাহিনীকে বেকায়দায় ফেলে দেয়। এমন এক নাজুক অবস্থায় পড়ে দিশেহারা মুসলিম বাহিনী যুদ্ধ ছেড়ে ছুটে পালাতে থাকে। খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন অরক্ষিত ও বিপন্ন হয়ে পড়ে। আনসারীদের ভেতর থেকে এগারোজন এবং মুহাজিরদের মাত্র একজন তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ ছাড়া আর কেউ তখন তাঁর পাশে ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মাত্র বারোজন সঙ্গীকে নিয়ে পাহাড়ের ওপরের দিকে ওঠার চেষ্টা করছিলেন। সেই মুহূর্তে মুশরিকদের দুর্ধর্ষ একটি ক্ষুদ্র দল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁর দিকে ছুটে আসে। আক্রমণের উদ্দেশ্যে এই দলটিকে ছুটে আসতে দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

مَنْ يَرُدُّ عَنَّا هؤُلَاءِ، وَهُوَ رَفِيْقِيْ فِي الْجَنَّةِ؟

'আমাদের ওপর আক্রমণ করতে আসা ওই দলটিকে কে প্রতিরোধ করতে পারবে? প্রতিদান হিসাবে জান্নাতে তাকে আমার সঙ্গী বানানো হবে।'

এত বড় সুসংবাদ লাভ করার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে তালহা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন,

'আমি ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি ওদের প্রতিরোধ করব।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,
'না, তুমি এখানেই থাকো।'

তখন এক আনসারী বললেন,
'আমি যাব ওদের প্রতিরোধ করতে।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,
'হ্যাঁ, তুমি যাও।'

আনসারী লোকটি একাই আক্রমণকারী শত্রুদের বিরুদ্ধে তুমুল সাহস নিয়ে লড়াই করে তাদের হিমশিম খাইয়ে দিলেন। কিন্তু একা একটি দলকে কতক্ষণ ঠেকানো যায়? অবশেষে তিনি শহীদ হয়ে জান্নাতে পৌঁছে গেলেন। এরই মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গীদের নিয়ে পাহাড়ের কিছুটা উঁচুতে উঠে পড়লেন। শত্রুরা আবার তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে কাছে এসে গেলে তিনি আবার পূর্বের মতো বললেন,

'ওদের ঠেকানোর মতো কেউ কি নেই?'

তালহা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আবারও বললেন,
'আমি আছি ইয়া রাসূলাল্লাহ।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আগের মতোই থামিয়ে দিয়ে বললেন,

'না, তুমি এখানে আমার সঙ্গেই থাকো, অন্য কেউ যাক।'

তখন আরেকজন আনসারী অনুমতি চেয়ে বললেন,
'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি যাব।'

তিনি বললেন,
'ঠিক আছে, তুমি যাও।'

এই আনসারী সাহাবীও সর্বশক্তি দিয়ে তাদের আক্রমণ এমনভাবে প্রতিহত করলেন যে, কিছু সময়ের জন্য তাদের আক্রমণ থেমে গেল। এই অবসরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গীদের নিয়ে পাহাড়ের আরও কিছুটা ওপরে উঠে পড়লেন। এই দ্বিতীয় আনসারীও লড়াই করতে করতে একসময় শহীদ হয়ে গেলেন। আক্রমণকারী বাহিনী আবারও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবারও সঙ্গীদের মধ্যে কাউকে আক্রমণ প্রতিরোধের আহ্বান জানালেন।

তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু এবারও নিজেকে পেশ করে বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে অনুমতি দিন, আমি ওদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য নিজেকে পেশ করছি।'

কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবারও তাকে নিবৃত্ত করে অন্য একজন আনসারীকে অনুমতি দিলেন। এভাবেই একে একে সকল আনসারী শহীদ হয়ে গেলেন। রাসূলের পাশে বেঁচে থাকলেন শুধু তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। এবার যখন আক্রমণকারী ক্ষুদ্র মুশরিক বাহিনী এগিয়ে এল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালহাকে অনুমতি দিয়ে বললেন,

'তালহা, এবার তোমার পালা, যাও ওদের প্রতিরোধ করো।'

এই ক্ষুদ্র বাহিনী যখন রাসূলকে আক্রমণ করতে আসে, তার পূর্বেই প্রিয় নবীর অবস্থা হয়ে পড়েছিল ভীষণ নাজুক। শত্রুদের আক্রমণে তাঁর দান্দান মুবারক শহীদ হয়ে গিয়েছিল। ঠোঁট মুবারক হয়েছিল ক্ষত-

বিক্ষত। চেহারা মুবারকে অস্ত্রের ফালি ঢুকে পড়ার ফলে সেখান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছিল। প্রচণ্ড আঘাত, প্রচুর রক্তক্ষরণ তাঁকে দুর্বল ও নিস্তেজ করে ফেলেছিল। এমন নিদারুণ পরিস্থিতিতে তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ আল-আনসারী আক্রমণকারী বাহিনীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি এমন সাহসী ও চৌকস আক্রমণ করলেন যে, দলটি হিমশিম খেয়ে সামনে অগ্রসর হওয়ার কথা ভুলে গেল। সেই সুযোগে তিনি বিদ্যুদ্‌গতিতে ছুটে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাঁধে তুলে পাহাড়ের খানিকটা ওপরে পৌঁছে দিলেন। ক্ষুদ্র দলটি আবার কাছাকাছি এসে পড়লে তিনি আবারও প্রচণ্ড বেগে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের বেশ কিছুটা পেছনে তাড়িয়ে নিয়ে গেলেন। এই সুযোগে ফিরে এসে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাঁধে নিয়ে পাহাড়ের আরও উঁচুতে সুরক্ষিত ও নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিলেন। শত্রুরা নিকটে এসে গেলে এবার তিনি রাসূলকে নিরাপদে রাখতে পারার বদৌলতে নতুন মনোবলে শাণিত হয়ে প্রচণ্ড বেগে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং আক্রমণকারী এই ক্ষুদ্র বাহিনীকে পরিপূর্ণরূপে প্রতিহত এবং তাদের আক্রমণের সক্ষমতা গুঁড়িয়ে দিয়ে প্রাণের চেয়ে প্রিয় রাসূলের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সম্পূর্ণ নিশ্চিত করতে সক্ষম হলেন।

আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন,

‘সেই মুহূর্তে আমি এবং আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বেশ খানিকটা দূরে শত্রুদের সঙ্গে লড়াইয়ে ব্যস্ত ছিলাম। লড়াই করে তাদের ময়দান থেকে বিতাড়িত করার পর আমরা দু’জনে মিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেবায় ছুটে গেলাম। তাঁর খেদমতে হাজির হলে তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়ে বললেন,

أُتْرُكَانِيْ وَانْصَرِفَا إِلَى صَاحِبِكُمَا، يُرِيْدُ طَلْحَةَ

‘আমার কাছে নয়, তোমরা তাড়াতাড়ি তালহার কাছে যাও।’

আমরা তালহার কাছে গিয়ে দেখি, প্রায় আশিটির মতো ছোট-বড় আঘাত তার সারা শরীরজুড়ে স্পষ্ট হয়ে আছে। বুকে ও পিঠে কোনো জায়গাই অক্ষত নেই। তির, তরবারি আর বর্শার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত আর রক্তস্নাত একটি মৃতপ্রায় দেহ বেহুঁশ পড়ে আছে। এক হাতের কবজি সম্পূর্ণ কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি গর্তে পড়ে আছে।'

ওহুদ যুদ্ধের পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় সময়ই বলতেন,

مَنْ سَرَّه أَنْ يَنْظُرَ إِلى رَجُلٍ يَمْشِيْ عَلى الْأَرْضِ قَدْ قَضى نَحْبَه فَلْيَنْظُرْ إِلى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ

'প্রকৃতপক্ষে শাহাদাতপ্রাপ্ত—শহীদ, অথচ এখনো জমিনের বুকে চলমান—এমন ব্যক্তিকে দেখে কেউ যদি খুশি হতে চায়, সে যেন তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহকে দেখে।'

আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওহুদ যুদ্ধের প্রসঙ্গ এলেই বলতেন,

ذٰلِكَ يَوْمٌ كُلُّه لِطَلْحَةَ

'ওহুদ যুদ্ধের সেই দিন! আহা! সেদিনের পুরো কৃতিত্বটাই ছিল তালহার দখলে।'

এটাই ছিল তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে 'জিন্দা শহীদ' আখ্যায়িত করার ইতিহাস। তাঁকে 'সর্বশ্রেষ্ঠ তালহা' (তালহাতুল খায়র) ও 'দানবীর তালহা' (তালহাতুল জূদ) আখ্যায়িত করার পেছনে রয়েছে একশো একটি কাহিনি। সেই কাহিনিগুলোর মধ্য থেকে একটি বিশেষ কাহিনি,

'তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন প্রচুর সম্পদ ও ধনভাণ্ডারের মালিক। তার ব্যবসা-বাণিজ্যও ছিল বিভিন্ন অঞ্চলে

বিস্তৃত। একবার বাণিজ্যিক মুনাফা হিসাবে ইয়েমেনের হাযরামাউত থেকে তার কাছে নগদ সাত লক্ষ দিরহামের বিরাট অঙ্ক এসে পৌঁছল। এত বিশাল সম্পদ রেখে তিনি রাত কাটাবেন এই চিন্তায় অস্থির হয়ে ঘুমহীন ও আতঙ্কিত হয়ে রইলেন।

তাঁর চোখে-মুখে দুশ্চিন্তা ও আতঙ্কের ছাপ দেখে তার স্ত্রী আবু বকর সিদ্দীকের মেয়ে উম্মে কুলসুম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা জিজ্ঞাসা করলেন,

'কী ব্যাপার আবু মুহাম্মাদ, আপনাকে এমন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছে কেন? আমার দ্বারা কি কোনো কষ্ট পেয়েছেন?'

তালহা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তৎক্ষণাৎ স্ত্রীর কথার জবাবে বললেন,

'না, না প্রিয়তমা! তোমার কারণে আমি কোনো কষ্ট পাইনি। তুমি তো বরং একজন মুমিনের সর্বোত্তম আদর্শ স্ত্রী। আমার দুশ্চিন্তা ও আতঙ্কের কারণ অন্যখানে। সারা রাত আমি ঘুমাতে পারিনি এই আতঙ্কে যে, এত বিশাল সম্পদ ঘরে রেখে যে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকে, সে আল্লাহর কাছে কী জবাব দেবে?'

তাঁর স্ত্রী উম্মে কুলসুম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বললেন,

'আপনি কেন চিন্তিত হচ্ছেন? আপনি তো আর অভাবী ও গরিব আত্মীয়দের এবং আপনার দরিদ্র দীনি বন্ধুদের কখনোই ভুলে থাকেন না। সুতরাং নিশ্চিন্ত মনে একটুখানি অপেক্ষা করুন। ভোর হয়ে গেলেই এই সম্পদের সবটুকু তাদের মাঝে বিলিয়ে দিন।'

তালহা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা স্ত্রীর পরামর্শে খুব খুশি হয়ে বললেন,

'আল্লাহ তোমার ওপর রহম করুন। তোমার পরামর্শে চিন্তামুক্ত হলাম। সত্যিই তুমি অতুলনীয় ব্যক্তির অতুলনীয় মেয়ে। আমার জীবন ধন্য তোমার মতো জীবনসঙ্গিনী পেয়ে।'

ভোর হতে না-হতেই সাত লক্ষ দিরহাম সম্পূর্ণ দান করে দিলেন মুহাজির, আনসার ও সাধারণ গরিব অসহায় পরিবারগুলোর মাঝে।

***

তালহা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দানশীলতার ব্যাপারে আরও বর্ণনা করা হয়,

'একবার জনৈক ব্যক্তি তালহা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে কিছু আর্থিক সাহায্যের জন্য এসে আলাপের সূত্রে জানালেন,

'আপনার সঙ্গে আমার আত্মীয়তার এমন সংযোগ রয়েছে, যার ভিত্তিতে আমি আপনার 'মীরাস'-এরও হকদার।'

লোকটির এই দাবি শুনে তালহা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন,

'জীবনে এই প্রথম শুনলাম যে, আপনার সঙ্গে আমার এত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার বন্ধন রয়েছে। যা হোক, যখন দাবি করছেন, আপনার জন্য আমার কাছে দু'টি প্রস্তাব রয়েছে :

এই মুহূর্তে আমার মালিকানায় একখণ্ড জমি রয়েছে—যা উসমান ইবনে আফ্‌ফান তিন লক্ষ মুদ্রার বিনিময়ে আমাকে কিনে দিয়েছেন।

আপনি চাইলে জমিটি নিতে পারেন আবার ইচ্ছা হলে জমির মূল্য অর্থাৎ তিন লক্ষ মুদ্রাও গ্রহণ করতে পারেন।'

লোকটি বললেন,
'জমি নয়, আমাকে নগদ মূল্যটাই দিন।'

তালহা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু লোকটির চাহিদামতো নিঃসংকোচে তিন লক্ষ মুদ্রা তার হাতে তুলে দিলেন।

***

অভিনন্দন তালহা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি। যাকে দেওয়া প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'সর্বশ্রেষ্ঠ তালহা' ও

‘দানবীর তালহা’ উপাধি সার্থক হয়েছে। মহান আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন। তার কবরকে নূরে ও রহমতে পরিপূর্ণ করে দিন। আমীন।

তথ্যসূত্র :

১. *আততাবাকাতুল কুবরা*, ৩য় খণ্ড, ৩১৪ পৃষ্ঠা
২. *তাহযীবুত তাহযীব*, ৫ম খণ্ড, ২০ পৃষ্ঠা।
৩. *আল-বাদউ ওয়াততারীখ*, ৫ম খণ্ড, ১২ পৃষ্ঠা
৪. *আল-জামউ বাইনা রিজালিস সহীহাইন*, ২৩০ পৃষ্ঠা।
৫. *গায়াতুন নিহায়া*, ১ম খণ্ড, ৩৪২ পৃষ্ঠা।
৬. *আররিয়াযুন নাযরাহ*, ২য় খণ্ড, ২৪৯ পৃষ্ঠা।
৭. *সিফাতুস সফওয়াহ*, ১ম খণ্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা।
৮. *হুলইয়াতুল আউলিয়া*, ১ম খণ্ড, ৭ পৃষ্ঠা।
৯. *যাইনুল মুযাইয়্যাল*, ১১ পৃষ্ঠা।
১০. *তাহযীবু ইবনি আসাকির*, ৭ম খণ্ড, ৭১ পৃষ্ঠা।
১১. *আল-মুহাব্বার*, ৩৫৫ পৃষ্ঠা।
১২. *রাগবাতুল আমাল*, ৩য় খণ্ড, ১৬ ও ৮৯ পৃষ্ঠা।
১৩. *আল-ইসাবাহ*, ২য় খণ্ড, ২২৯; অথবা *আত্তারজামা*, ৪২৬৬।
১৪. *আল-ইসতীআব*, ২য় খণ্ড, ২১৯ পৃষ্ঠা।